যজুর্বেদ সংহিতা – তৃতীয় অধ্যায়

সুকুমারী ভট্টাচার্য

যজুর্বেদ সংহিতা

বস্তুগত সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে যজুর্বেদে প্রতিফলিত যে সমাজচিত্র তা ঋগ্বেদের সমাজচিত্র থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। আর্যরা যখন নিজেদের বসতিতে সুস্থিত হয়ে যুদ্ধ ক'রে আশপাশের অঞ্চলগুলি অধিকার করতে শুরু করলেন এবং উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে ধীরে ধীরে কিছু কিছু পরিবর্তনের সূচনা হ'ল–গোষ্ঠীজীবন কিন্তু তখনও মূলত অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হওয়ার সময়ে সাময়িকভাবে যে বাণিজ্যব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল, যজুর্বেদের সময়ে তা আবার আরম্ভ হ'ল। তামা, ব্রঞ্জ, সীসা, টিন এবং লোহাজাতীয় ধাতু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আনীত হয়ে আর্য-আধ্যুষিত সেই সব অঞ্চলে কাজে ব্যবহৃত হ'ত, সেগুলি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে এই বাণিজ্য পথের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। যজুর্বেদীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু তখন স্পষ্টতই উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সরে গিয়েছিল। কৃষিব্যবস্থা তখন উন্নততর পর্যায়ে। দিনপঞ্জীর সাহায্যে মৌসুমি বৃষ্টিপাত তখন মোটামুটি অনেকটা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যেত, ফলে উপযুক্ত ঋতুতে কৃষিকর্মের ব্যবস্থাপনা সম্ভবপর হয়েছিল। লোহার লাঙল তখনও পর্যন্ত প্রচলিত হয় নি, লম্বা

বাঁটযুক্ত কোদাল বা কাঠের তৈরি আদিম পর্যায়ের লাঙল দিয়ে চাষ হত বলে কৃষকের কঠোর পরিশ্রমের তুলনায় স্বল্প পা গুণ ফসলই উৎপন্ন হত। সমস্ত অনুষ্ঠান এবং প্রার্থনায় যেহেতু শস্য, পশু ও ধনের প্রাচুর্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। তাই সহজেই অনুমান করা চলে যে, তাদের মধ্যে খাদ্যলাভের অনিশ্চয়তা ও খাদ্যের স্বল্পতাই আভাসিত হয়েছে। রাজা ও গোষ্ঠীপতিদের শাসন ও অধিকার বিস্তৃত ছিল কিছু গ্রামপুঞ্জের ওপরে। গ্রাম শব্দটি যদিও প্রাথমিকভাবে বিচরণশীল পশুপালক গোষ্ঠীর সমবায়কেই সূচিত করত, যজুর্বেদে তার তাৎপর্য হ'ল, মোটামুটিভাবে সুনির্দিষ্ট জনবসতি। অর্থাৎ বীজ বপন ও ফসল সংগ্রহের মধ্যবর্তী মাসগুলিতে কোনো জনগোষ্ঠী যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করত, তাই গ্রামরূপে পরিচিত ছিল–কেননা সে সময়ের পরে ঐ জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধতর কর্ষণযোগ্য ভূমির সন্ধানে পূর্বদেশের দিকে পুনরায় যাত্রা করত। কৃষির পরিপূরক রূপে খাদ্যসংগ্রহ, মৃগয়া ও গোপালনের দ্বারা সম্পদবৃদ্ধিও প্রচলিত ছিল। আচার-অনুষ্ঠান এবং পুরোহিতদের কার্যকলাপের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিভাজন যদিও খাদ্য-সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাচুর্যের ইঙ্গিত বহন করছে, কিন্তু যজুর্বেদে সাধারণভাবে সমাজের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সাধারণ মানুষের খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে বিরলতা ও অনিশ্চয়তারই প্রমাণ দেয়। তুলনামূলকভাবে সমাজের সমৃদ্ধতর অংশ যদিও বিবিধ কুটিরগত কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করত তবুও দরিদ্রতর বৈশ্য, দেশিয় আদি কৃষক, পশুপালক, ক্ষুদ্র শিল্পী এবং শূদ্রদের জন্য খাদ্যের যোগান নিরতিশয় স্বল্প ছিল।

ঋগ্বেদের শেষ পর্যায়ে রচিত একটি মন্ত্রে যে জাতিভেদ উল্লিখিত হয়েছিল, যজুর্বেদে এসে সে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত সত্য ; খাদ্য বণ্টন ও সম্পদ সংগ্রহে গুরুতর অসাম্য যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গোড়াপত্তন করেছিল, যজুর্বেদ তা তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে সমাজ ক্রমশ স্পষ্ট কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। শ্রেণীগত ভিন্নতার ফলেই সমাজের একটি বিশেষ অংশ পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হ'ল যাদের শ্রেণী-স্বার্থ সাধারণ জনতার বৃত্ত থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে গেল। যজুর্বেদ রচনার অন্তিম পর্যায়ে এই প্রবণতা আনুষ্ঠানিক ধর্মগ্রন্থ রচনার সৃজনশীল পর্যায় অর্থাৎ প্রধান 'ব্রাহ্মাণ' গ্রন্থসমূহ প্রণয়নের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিদ্যমান ছিল। তখন আমরা রাজা, বিজয়ী বীর, সম্পদশালী ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষকদের প্রয়োজনে বহু নুতন যজ্ঞানুষ্ঠান উদ্ভাসিত হতে দেখি। আবার এখানে আরও একবার প্রমাণিত হচ্ছে যে,

সংখ্যাগত দিক দিয়ে সাধারণ জনতার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ অর্থাৎ প্রাথমিক উৎপাদকরা ও ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পে ব্যাপৃত কারিগররা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিষ্পেষিত। যখন মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসম্পন্ন ও সম্পদশালী ব্যক্তির হাতে সামাজিক ধন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল সে সময়ে যজুর্বেদের অনুষ্ঠানগুলি বহুধা বিভাজিত ও বর্ধিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অধিকাংশই অতি তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে সেই খাদ্য-বিরলতার দিনগুলিতে নিজেদের শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হ'ত ব'লে তারা ক্রমশ অতিদরিদ্র নিঃসম্বল জনতায় পরিণত হচ্ছিল। সার্বিক বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি যে, পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজ ও সাহিত্য পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় মূলগতভাবেই ভিন্ন, কেননা অর্থনৈতিক অন্তর্বিন্যাস ও সাংস্কৃতিক ঊর্ধবিন্যাস–দুটোই প্রাথমিক বৈদিক যুগ থেকেই চরিত্রগতভাবে পৃথক্ হয়ে পড়েছিল।

সায়ণাচার্য যে ঋগ্বেদের আগেই যজুর্বেদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন, তার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, যজ্ঞে যজুর্বেদের গুরুত্বই সর্বাধিক। ঋগ্বেদের পুরোহিত হোতা যেখানে ঋগ্বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করতেন এবং সামবেদের পুরোহিত উদ্গাতা সামগান করতেন, সেখানে যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যু প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন এবং সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্রও উপাংশু স্বরে উচ্চারণ করতেন।

যজুর্বেদ-সংহিতা দুটি স্পষ্ট শাখায় বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। অনুষ্ঠান পরিচালনার সময় যজুর্বেদের পুরোহিত যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, শুক্ল যজুর্বেদে শুধু সেইগুলিই পাওয়া যায়। তাই শুক্ল যজুর্বেদের 'ব্রাহ্মণ'সমূহ স্বতন্ত্র রচনারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও কৃষ্ণ যজুর্বেদের 'ব্রাহ্মণগুলি প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে প্রথিত, গদ্যে রচিত নির্দেশমালা ও ব্যাখ্যাসমূহের ধারাবাহিক সংযোজন। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও তার বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রগুলিও রয়েছে। মন্ত্র-বহির্ভূত অন্যান্য অংশে গদ্যে রচিত এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহের পূর্বগামী।

শুক্ল যজুর্বেদের একমাত্র সাহিত্যকর্ম বাজসনেয়ী-সংহিতাটি দুটি শাখায় ঈষৎ ভিন্ন পাঠে পাওয়া যায়–কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন ; এই বিভাজন 'ব্রাহ্মণ'-গ্রন্থগুলির মধ্যেও রয়েছে। অবশ্য শুক্ল যজুর্বেদ প্রতিশাখ্য এই দুটি ভাগকেই একসঙ্গে উল্লেখ করেছে। আলোচ্য শাখা দুটির মধ্যে কাণ্বই প্রাচীনতর। দুটি শাখার মধ্যে পাঠগত ভিন্নতার মূল কারণ

ভৌগোলিক ; যখন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম এই শ্রুতি-সাহিত্য মৌখিকভাবে সঞ্চারিত হত, স্থানগত ভিন্নতায় স্বাভাবিকভাবেই পাঠও ভিন্ন হয়ে পড়ছিল। মাধ্যন্দিন শাখায় বাজসনেয়ী সংহিতা মোট ৪০টি অধ্যায়, ৩০৮ অনুবাক্ ও ১৯৭৫ কণ্ডিকায় বিভক্ত। প্রথম ২৫টি অধ্যায়ে সাধারণভাবে প্রচলিত যে সব যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি সূত্রবদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে—দর্শপুর্ণমাস (১-২), অগ্নিহাোত্র অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন সংক্ষিপ্ত যজ্ঞানুষ্ঠান (৩), সাধারণ সোমযাগ (৪-৭), সোমযাগের দুটি বিশেষ ধনন (৯-১০), যজ্ঞবেদী নির্মাণ ও যজ্ঞাগ্নিসমূহের আধান (১১-১৮), সৌত্রিমণী যাগ, ইন্দ্রের প্রতি নিবেদিত বিশেষ কিছু কিছু অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের নানা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানবিধির বিবরণ (১৯-২১) এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি (২২-২৫)। এদের মধ্যে প্রথম আঠাশটি অধ্যায় পরবর্তী সাতটি অধ্যায়ের তুলনায় প্রাচীনতর। সংহিতার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ২৬–৩৫তম অধ্যায়। পরবর্তীকালে সংযোজিত ; তাই ভাষ্যকার মহীধর এই অংশকে 'খিল' বলে অভিহিত করেছেন। শেষ পাঁচটি অধ্যায় অর্থাৎ ৩৬-৪০ অধ্যায়সমূহে পুরুষমেধ, সর্বমেধ, পিতৃমেধ ও পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রবর্গ্য যজ্ঞের বিধি সূত্রবদ্ধ হয়েছে। এই সমস্ত অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশ স্পষ্টতই দার্শনিক ব্যঞ্জনাগর্ভ ; যেমন শতরুদ্রীয় নামক রুদ্রদেবের প্রতি নিবেদিত বিখ্যাত সূক্তটি (১৬শ অধ্যায়) ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত (৩১তম অধ্যায়) এবং 'তদেব' সূক্ত (৩২তম অধ্যায়)। এছাড়া ৩৪তম অধ্যায়ে 'শিবসংকল্প' নামক সুপরিচিত সূক্তটিতে নতুন এক ধরনের দেববাদী ভাবনার উন্মেষ ঘটেছে। সংহিতার শেষ অধ্যায়টিই (৪০) ঈশোপনিষদ।

শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে যজ্ঞবিধি সম্পর্কিত রচনারূপে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সংকলিত হওয়ার ফলে তাতে বহু শাখার বিকাশ ঘটেছে ; কখনও অঞ্চল এবং কখনও পরিবারভেদে এই সংহিতায় পাঠগত ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত পাঁচটি বা ছয়টি শাখার স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে– তৈত্তিরীয়, কাঠক, আত্রেয়, হরিদ্রাবিক, মানব এবং মৈত্রায়ণীয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তৈত্তিরীয় শাখা আপস্তম্ব ও বৌধায়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ; মধ্যদেশে তার উৎপত্তি হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাজসনেয়ী শাখা উত্তর পূর্বকাশ্মীরে এবং কাঠক ও কপিষ্ঠল পাঞ্জাবে, মৈত্রায়ণীয় গুজরাট, বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং মানবশাখা ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

কাঠক ও কপিষ্ঠল সংহিতা চারায়ণীয় (সাধারণভাবে চরকের সঙ্গে সম্পর্কিত) শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠ বিশ্লেষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এটি কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদের মধ্যে কিছুটা সমন্বয় করতে চেয়েছে। স্বভাবত স্বতন্ত্র এই পাঠ মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত ; প্রথম তিনটি অধ্যায় আবার চল্লিশটি স্থানক বা উপবিভাগে বিভক্ত। চতুর্থ অধ্যায়টি বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত সম্পদের বিবরণ দিয়েছে, সে সব মূলত তাৎপর্যহীন। পঞ্চম বা শেষ অধ্যায়টি অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ দিয়েছে।

আত্রেয়-সংহিতা মোটামুটিভাবে তৈত্তিরীয় শাখারই ভিন্ন পাঠ ; এতে কয়েকটি কাণ্ড রয়েছে–প্রত্যেকটি কাণ্ড কয়েকটি 'প্রশ্নে' এবং প্রত্যেকটি 'প্রশ্ন' কয়েকটি অনুবাকে বিন্যস্ত। মৈত্রায়ণীয় বা কলাপ শাখার পাঠ হরিদ্রাবিক বলে অভিহিত। যাস্কাচার্য যজুর্বেদের ব্রাহ্মণরূপে একমাত্র মৈত্রায়ণীয় শাখারই উল্লেখ করেছিলেন, এতে মনে হয় তিনিই যজুর্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মাণগুলিকে সুবিন্যস্ত করে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন।

রচনাকাল

'কাণ্ডনুক্রমণ' গ্রন্থে আমরা একটি সময়ানুক্রমণীর সন্ধান পাই, তবে তা তথ্যভিত্তিক কি না সে সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা নেই। এতে কথিত হয়েছে, বৈশম্পায়ন যজুর্বেদীয় শ্রৌত ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন ; পরে ঐ ঐতিহ্য যথাক্রমে যাস্ক, পৈঙ্গী, তিত্তিরি, উখ ও আত্রেয়ের নিকট উপনীত হয়। সমালোচক কীথ্ ব্যাকরণগত প্রয়োগগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, যজুর্বেদ সংহিতা ও ঋগ্বেদ একই ভাষাগত স্তর ও কালগত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয় যে,

সমগ্রভাবে ঋগ্বেদের তুলনায় যজুর্বেদ সামান্য পরবর্তীকালের রচনা। যদিও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ও প্রথম মণ্ডলের প্রথমাংশ সম্ভবত যজ্ঞবেদ সংকলনের সমকালীন।

তৈত্তিরীয় সংহিতার পাঠ যেহেতু সবচেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বজনপরিচিত, তাই তাকে বিশ্লেষণ করে আমরা যজুর্বেদের বিষয়বস্তু ও চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারি। পাঁচটি কাণ্ডের রচয়িতা রূপে যথাক্রমে প্রজাপতি, সোম, অগ্নি, বিশ্বেদেবাঃ এবং স্বয়ম্ভূর নাম উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্যে পরবর্তী কালের দুজন দেবতা–প্রজাপতি ও স্বয়ম্ভূর উল্লেখ থাকায় একথাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, এই সংহিতা অনেক পরেই রচিত হয়েছে। বিভিন্ন কাণ্ডে বিন্যস্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে আমরা অত্যন্ত অপটু সম্পাদনার নিদর্শন পাই। বিভিন্ন যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের বর্ণনা এতই অসংলগ্নভাবে পাঠে নিবেশিত হয়েছে যে, কোথাও কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সুশৃঙ্খল বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু

যজুর্বেদ-সংহিতা সাধারণভাবে প্রধান সামূহিক যজ্ঞ অর্থাৎ শ্রৌতযাগগুলির বিবরণ দিয়েছে – তবে, এছাড়াও এতে সামাজিক উৎপাদন ও গার্হস্থ্য আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিবরণও কিছু রয়েছে। সংহিতার দুই-তৃতীয়াংশ সুনির্দিষ্ট যজুর্বেদীয় মন্ত্রের উদাহরণ : অবশিষ্ট অংশের প্রায় অর্ধেক প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণত বা আংশিকভাবে ঋগ্বেদ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে, ঋগ্বেদের বিন্যাসক্রম সেখানে অনুসৃত হয় নি, বিশৃঙ্খলভাবে মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত হয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় ঋগ্বেদের উদ্ধৃতিগুলি বিশুদ্ধতমভাবে সংরক্ষিত হলেও মৈত্রায়ণী এবং কাঠকী-কপিষ্ঠল সংহিতায় কিন্তু এক ধরনের উদ্ধৃতি যথেচ্ছভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। কখনও কখনও ঋগ্বেদ-সংহিতাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক পা সঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবেই সেই সব মন্ত্রাংশকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। স্পষ্টতই সংহিতা-রচনার সৃজনশীল পর্যায় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যখন নূতন নূতন যজ্ঞানুষ্ঠান আবিষ্কৃত হচ্ছিল, তখন আবৃত্তি বা গানের জন্য

নূতন সংহিতার যোগান দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই পূর্ব-প্রযুক্ত প্রাচীনতর উপাদান এই সব নবোদ্ভাবিত যজ্ঞের ক্ষেত্রে পুনরায় ব্যবহৃত হতে লাগল, কখনও কখনও প্রসঙ্গের সঙ্গে তার সম্পর্কও আর রইল না। ফলে, এই পর্যায়ে সংহিতার পাঠ ও প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে।

যজুর্বেদ-সংহিতায় নিম্নোক্ত যজ্ঞসমূহ বিবৃত হয়েছে–দর্শপূর্ণমাস, হবির্যজ্ঞ, পশুযাগ, বাজপেয়, রাজসূয়, দীক্ষণীয়েষ্টি, সোমযাগ, সৌত্রামণী, প্রবার্গ্য, অগ্নিচয়ন, অশ্বমেধ ও পুরুষমেধ। এদের মধ্যে অধিকাংশই আর্যদের ভারতভূমিতে বসতি স্থাপনের পরবর্তীকালে পরিকল্পিত হয়েছিল বলে এতে বহুতর পুরোহিতের অংশগ্রহণের অবকাশ আছে। পরিশীলিত সূক্ষ্মতা এবং সীমাহীন প্রায়োগিক জটিলতাও তাই এগ্রন্থে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যজুর্বেদ সংহিতা রচনার পশ্চাতে সক্রিয় প্রেরণা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ; যজ্ঞের সংখ্যা যখন বহুগুণ বধিত হল। তখন আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খগুলির বিস্তায় অনিবার্থ হয়ে উঠল যাতে তৎকালীন নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতে এরা শুধু গ্রহণযোগই নয়, অবশ্যপালনীয়ও হয়ে উঠে। আবার কাহিনী বা বিবৃতিমূলক সূক্তগুলি স্পষ্টতই সংহিতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে না। বস্তুতঃ, কৃষ্ণ-যজুর্বেদ এজন্যই অনন্য কেননা অন্য তিনটি সংহিতায় প্রার্থনা ও প্রশস্তিবাচক মন্ত্র থাকলেও কৃষ্ণ-যজুর্বেদে আমরা প্রথম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের নিকট যজ্ঞের তাৎপর্যঠিক কি এবং কেন সেগুলি অনুষ্ঠেয় তার ইঙ্গিত পাই। ফলে, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বিচারে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহের পূর্বগামী।

অনুষ্ঠান চর্যা

যজুর্বেদে বর্ণিত যজ্ঞাগুলির মধ্যে অশ্বমেধ, অগ্নিচয়ন ও সোমযাগ সবচেয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞ। লক্ষণীয় যে, সম্পাদনার প্রক্রিয়ার যে বিবরণ যজুর্বেদে পাই তা রচনার দিক থেকে কতকটা শিথিল। অশ্বমেধের বিবৃতিতে অন্তত দু'বার ছেদ পড়েছে। একটানা বিবৃতির পরিবর্তে কখনও আপ্রীসূক্ত, কখনও বা 'অশ্ব'শব্দের প্রত্নপৌরাণিক ব্যাখ্যা, কখনও বা সোমযাগ, কখনও বা যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি যথেচ্ছ যজ্ঞ

প্রক্রিয়ার বিবরণের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে বিচিত্র অর্থযুক্ত বহুবিধ মন্ত্রের বর্ণনা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও আপ্তি, পর্যাপ্তি, অভূ, অনুভু, অপাব্য, যব্যহাোম, সন্ততিহাোম, প্রসুক্তিহাোম, অন্নহাোম, শারীরহাোম ইত্যাদি।

স্পষ্টতই যজুর্বেদে যে প্রবণতাকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, তা হল যজ্ঞকে ক্রমশ জটিলতর, ব্যাপকতর, অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনাযুক্ত ও গূঢ়ার্থবহ করে তোলার প্রবণতা। অশ্বমেধের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : কোনও ক্ষমতাশালী স্থানীয় গোষ্ঠীপতি ধীরে ধীরে রাজার পদবীতে সার্বভৌম সম্রাটের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে তবেই অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজমানের, রাজ্যটির দুর্বলতর প্রতিবেশী এবং শত্রুগণের ওপরে আধিপত্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেত। মূল যজ্ঞের বর্ণনা যে বারবারই অগ্নিচয়ন ও সোমযাগের মতো সুস্পষ্ট ব্রাহ্মণ্য-ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা বিঘ্নিত হয়েছে, এতেই পুরোহিত শ্রেণীর বিশেষ গুরুত্ব অভিব্যক্তি। অশ্বের বিভিন্ন প্রতিশব্দের মধ্যে সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিচিত্রে ধরনের, অনুষ্ঠানগুলির সমন্বয় প্রচেষ্টা আভাসিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সংখ্যার, আঙ্গিকের ও বর্ণের রহস্যময় ব্যাখ্যার দ্বারা বিভিন্ন দেশের প্রচলিত নিগূঢ় প্রক্রিয়ার প্রতীকগুলিকে যজ্ঞের দ্বারা ব্যাখ্যা করে যজ্ঞকে গূঢ় ব্যঞ্জনা দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। এই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের উর্বরতাচর্যা ও আঞ্চলিক উৎসব এবং প্রহেলিকপূর্ণ গূঢ় বিদ্যার সংযোগে অশ্বমেধ যজ্ঞ সর্বতোভাবে মূল বিশ্ব-প্রক্রিয়ার গ্রন্থিল প্রতীকী অভিব্যক্তি অর্জন করতে চেয়েছে। অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানে প্রচুর প্রত্নপৌরাণিক উপাদান রয়েছে, যার অধিকাংশই দুরধিগম্য, গূঢ়ার্থবহ ও অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনাময়–সংস্কৃতির অপরিশীলিত আদিমতর কোনও অধ্যায়ের স্মৃতি তার মধ্যে নিহিত। বস্তুত, এই অনুষ্ঠানে আদিমতম ও নবীনতম এবং এ উভয়ের অন্তবর্তী নানা পর্যায়ের কৃষ্টি ও চিন্তার বিচিত্র সহাবস্থান ঘটেছে। মনে হয়, ভারতভূমিতে নবাগত আর্যজাতির প্রতীকী প্রতিষ্ঠা যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি অর্জন করতে প্রয়াসী হয়েছিল। বহুস্তরে বিন্যস্ত, দীর্ঘকালব্যাপী জটিল যজ্ঞপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আর্যদের কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম অভিব্যক্তি। অগ্নিচয়নে বেদী নির্মাণকালে ইটের জটিল বিন্যাসের মধ্যে নিবেশিত তিনটি মৌলিক প্রতীক–পদ্মপত্র, ভেক ও স্বর্ণনির্মিত মানব-মূর্তি–সম্ভবত ভারতবর্ষের স্থল ও জলভূমির উপর আর্যদের প্রভুত্বেরই দ্যোতক। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু যে বৃষ্টিপাত,

তার প্রতীক যেমন পদ্মপত্র ও ভেক, তেমনি স্বর্ণমানব একদিক দিয়ে সূর্য ও অন্যদিক দিয়ে কর্ষণরত মানুষের প্রতীক। আমরা জানি যে, সোনার তৈরি একটি থালা সূর্যাস্তের পর যজ্ঞীয় জলকলসের উপরে ঢাকা থাকত ; এটি সূর্যের প্রতীকরূপে পরিগণিত হত। অর্থাৎ মূলত স্বর্ণ উর্বরতাচর্যারই একটি মৌলিক প্রতীক।

দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী যে সোমযাগ, সত্র, তা স্পষ্টতই অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ ; তৈত্তিরীয়সংহিতায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অংশ হওয়া ছাড়াও ষষ্ট ও অষ্টম কাণ্ডে এই যজ্ঞটিই প্রধান বিষয়বস্তু। সোমের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে যদিও বিতর্ক রয়েছে, তবু এটা অন্তত স্পষ্ট যে, সোমরসের উত্তেজক গুণের জন্য সোমযাগ একাহ যজ্ঞ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে কালের ব্যাপ্তিতে বাড়তে বাড়তে (দ্বাদশাহ, বর্ষব্যাপী গবাময়ন সত্র) শেষ পর্যন্ত দ্বাদশবর্ষব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠান সত্রে পরিণত হয়েছিল। দীর্ঘকালব্যাপী সোমপানের অভ্যাস মত্ততা ও আতিশয্য আনে। সোম যখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল তখন শেষপর্যন্ত মূল সোমের পরিবর্তে ভিন্ন জাতীয় বিকল্প নানা উদ্ভিজ্জ ব্যবহারের নির্দেশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এইসব উদ্ভিজের যেহেতু কোনও মাদকতা ছিল না, তাই বহু অনুপুঙ্খাযুক্ত সোমযাগের অনুষ্ঠান ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে, ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারিয়ে ধীরে ধীরে বাহুল্যে পর্যবসিত হয়ে গেল। সোমকে যেহেতু বারবার 'রাজা' ও 'অতিথি' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে, এতে মনে হয় যে, অবচেতনায় বহিরাগত আর্যদের শাসকররূপে প্রতিষ্ঠা লাভই এই অভিধাগুলির মধ্যে নিহিত ছিল। সঙ্গীত ও নৃত্যমুখর আনন্দ উৎসবে বহু দেবতার প্রতি নানাভাবে পানীয় নিবেদন বিজয়োৎসবের চিত্রকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। সোম সম্ভবত অনার্য জনগোষ্ঠী দ্বারা অতিযত্নে সুরক্ষিত ছিল ; আর্যরা যে প্রবঞ্চনার দ্বারা তা সংগ্রহ করতেন তার ইঙ্গিত রয়েছে একটি বিশেষ প্রত্নকথায়–গন্ধর্বদের দ্বারা সুরক্ষিত সোমকে বিষ্ণু, চাতুর্যের দ্বারা সংগ্রহ করেছিলেন।

রুদ্রকে সোমযাগের অংশভাগী করা হয় নি, কারণ তার কল্পনার সঙ্গে স্বভাবত ভয় ও অমঙ্গলের নানা অনুষঙ্গ সম্পৃক্ত ছিল। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা অগ্নি এই যজ্ঞের বিশেষ প্রকৃতির জন্যই অপেক্ষাকৃত স্বল্প শুরুত্বের অধিকারী। পরবর্তী সাহিত্যে অশ্বীরা সোমরসের অংশ লাভে বঞ্চিত হলেও এখানে তিনটি সবনেই তাঁদেরকে প্রাপ্য হব্যের সোমরসে অংশ দেওয়া হয়েছে। প্রাতঃসবনটিই সম্ভবত আদি ও মৌলিক অনুষ্ঠান, যেহেতু ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম পর্যায় থেকেই তার অস্তিত্ব রয়েছে। মাধ্যদিন সবন

প্রায় সম্পূর্ণতই ইন্দ্র ও মরুদগণের উদ্দেশে নিবেদিত। তৃতীয় সবন স্পষ্টতই পরবর্তীকালে সংযোজিত-সবিতা, আদিত্যগণ, বিশ্বেদেবাঃ ও অগ্নি তার অংশভাক। প্রাতঃকালে সোম সংগৃহীত হত, প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবন পর্যন্ত উদ্ভিজটি সতেজ থাকত এবং স্বভাবতই সন্ধ্যায় শুকিয়ে উঠত। তাই, তখন সেই শুকনো সোমকে জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে আপ্যায়ন করা (অর্থাৎ পীন করে তোলা) হত, যাতে তার থেকে রস নিষ্কাশন করা যায়। লক্ষণীয়, এ সবনের নাম কাল দিয়ে নির্ণীত নয়, পরবর্তী সংযোজন, তাই একে শুধু তৃতীয়-সবনই বলা হয়েছে। সোমযাগকে সর্বব্যাপী করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় সবনে অপ্রধান দেবতাগণও উল্লিখিত হয়েছেন ; এমনকি, দেবায়িত পিতৃগণকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর্যদের ধর্মীয় জীবনে পিতৃ উপাসনা যে অন্যতম প্রধান দিক ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানে।

অন্যান্য যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দর্শপূর্ণমাস, রাজসূয়, সৌত্রামনী ও পশুযাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দর্শপুর্ণমাস যজ্ঞ নিশ্চয়ই অনেক প্রাচীন কালেই পরিকল্পিত হয়েছিল– আর্যরা যখন যাযাবর পশুপালক জীবনে সময়-স্মারক রূপে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাকে অর্থাৎ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের চূড়ান্ত পরিণতির তিথি দুটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, সেই সময়কার স্মৃতি এই অনুষ্ঠান দুটিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাছাড়া, আর্থতিতে দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার পশুপালক জীবনেরই ইঙ্গিত বহন করে। পরবর্তী পর্যায়ে পরিকলিত চতুর্মাস্য যজ্ঞে চারটি ঋতুর উপযোগী আহুতি প্রদান করা হত– বৈশ্বদেব, বরুশপ্রঘাস, সামমেধ ও শুনাসীর। কৃষিজীবী আর্যদের জীবনযাত্রার সঙ্গে চাতুর্মাস্য যাগের এই অংশটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। নির্ঋতি, রুদ্র, করুন ও ত্র্যম্বকের প্রতি নিবেদিত কিছু কিছু প্রতিষেধক ও প্রায়শ্চিত্তমূলক অনুষ্ঠান আর্যদের তৎকালীন জীবনধারার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ, যেহেতু শস্য ও পাতালের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের অশুভ ক্ষমতা সম্বন্ধে ভীতিই তাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদনের মূল প্রেরণা। লক্ষণীয় যে, এই সব আহুতি রয়েছে যজ্ঞের সূচনায় অর্থাৎ নেতিবাচক ভয়ংকর শক্তিগুলিকে কোনরকমে প্রশমিত করে তবেই যজ্ঞ ইতিবাচক ও কল্যাণপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। পরবর্তীকালে সংযোজিত এ ধরনের আরও কিছু স্তোত্রে বিভিন্ন গৌণ দেবতা এবং রাক্ষস, অনুমতি, রাকা, সিনীবালী ও কুককে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রাজার প্রকৃত অভিষেক-বিষয়ক অনুষ্ঠান শুরু হয় একাদশ রত্নী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, রাজন্য, মহিষী, পরিবৃক্তি, সেনানী, সূত, গ্রামণী, ক্ষত্তা, সংগ্রহীতা, ভাগদুঘ ও অক্ষাবাপ-এর গৃহে একাদশ

রত্ন হাব্য নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে। এই সমস্ত ব্যক্তি যেহেতু রাজকীয় ক্ষমতার স্তম্ভ-স্বরূপ যজ্ঞে তাই আনুষ্ঠানিকভাবে এদের গুরুত্ব স্বীকার করা হত। পরবর্তী দেবাসু নামক বিভাবে বৃহস্পতির মতো নবীন দেবতার প্রাধান্য থাকায় সহজেই অনুমান করা যায় যে, অভিষেক-অনুষ্ঠানটি পরবর্তীকালেই পরিকল্পিত হয়েছিল, যখন গোষ্ঠী ও কৌমগুলি ছোট ছোট সামন্তরাজার অধীনে সংগঠিত হয়ে রাজ্যের সৃষ্টি করছিল। তাছাড়া, কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত জনগোষ্ঠীর পক্ষেই শুধু রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন করা স্বাভাবিক। সমাজে তখন অন্তত বৃত্তিগত জাতিভেদ প্রথা যে সুস্পষ্ট চরিত্র পেয়ে গেছে, তারও নিদর্শন আমরা পাই। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজন্য ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থজনিত দ্বন্দ্বের আভাসও পাওয়া যায়। অভিষেকের প্রয়োজনে যে সমস্ত স্থান থেকে পবিত্র জল আহরণের উল্লেখ রয়েছে, তা আর্যদের প্রাথমিক বসতিগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের নিদর্শন। রাজার একাধিপত্যসূচক যে সমস্ত অনুষ্ঠান অভিষেকের অঙ্গ ছিল, তা তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের স্বল্পালোকিত দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে সর্বসমক্ষে অতিজাগতিক ও নৈতিক গুণযুক্ত দেবতাকাপে বর্ণনা করা হত ; বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে তাকে একাত্ম করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা হত। অভিষেকের অন্তিম পর্যায়ে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বিশেষভাবে নিবেদিত দশপেয় অনুষ্ঠানে দশজন ব্রাহ্মণ একই পাত্র থেকে যুগপৎ সুরাপানের মাধ্যমে সদ্য অভিষিক্ত নূতন রাজা ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করতেন। সম্ভবত, আরও পরবর্তীযুগে উদ্ভাসিত প্রবর্গ যাগের অনুষ্ঠানে সূর্যদেবের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অশ্বীদের উদ্দেশে 'মহাবীর' নামক উত্তপ্ত রক্তবর্ণ পাত্রে দুগ্ধ অর্পণ করা হত।

অশ্বমেধ যজ্ঞে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত কৌম ও জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার একত্রে সমন্বিত হয়েছিল–তবে রাজনৈতিক বিজয়লাভের প্রতীকী ঘোষণাই এর যজ্ঞের উদ্দেশ্য। বিবিধ প্রকারের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান, গূঢ়ার্থবহ অক্ষক্রীড়া, প্রকৃত অতীত ইতিহাস থেকে সামূহিক অবচেতনায় সংকলিত লুণ্ঠন-অভিযানের কাহিনীগুলিকে কেন্দ্র করে প্রত্নকথা নির্মাণ ও গোষ্ঠীগতভাবে আনুষ্ঠানিক মদ্যপান–এই সমস্ত আদিপর্বে সম্ভবত অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল না। খুব সম্ভব, প্রাথমিক পর্যায়ে মূল অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত ও সরল থাকলেও ঐতিহাসিক কারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র

আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বহুবিধ প্রতীকী অনুষ্ঠানিকলাপের সমন্বয়ে তা শেষ পর্যন্ত জটিল ও বিচিত্র আকার ধারণ করে।

বাজপেয় যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খগুলি বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয় যে, মূলত সোমযোগেরই সামান্য একটু ভিন্ন অভিব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন জনপ্রিয় উৎসব ও অনুষ্ঠান সংমিশ্রিত হয়ে আলোচ্য অনুষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছিল। শরৎকালে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞটির বিভিন্ন পানিপাত্রের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষণীয় ; এদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'ঐন্দ্রি' বা 'বাজপেয়' নামক পান-পাত্রে। স্পষ্টতই ইন্দ্র এখানে প্রধানতম দেবতা এবং যজ্ঞের নামকরণেও সেই ইঙ্গিত। বর্ষা শেষের পৃথিবীতে শরৎকালেই রাজারা বিজয় অভিযানে বেরোতেন। এই বিজয়কামী রাজাদের আদি প্রতিভূ ইন্দ্র, যিনি ক্ষত্রিয়াশক্তির প্রতীক ; সোম এবং সুরাপানে যিনি অভ্যস্ত। তাই, বাজ (শক্তি) পানের জন্য নির্দিষ্ট এই শারদ যজ্ঞে ইন্দ্র ও তার সহযোগী মরুদগণ অনুরূপ গৌরবের অধিকারী। এই যজ্ঞে প্রজাপতির উপস্থিতি কিছু কিছু অংশের তুলনামূলক নবীনতাই প্রমাণ করে। প্রজাপতি এখানে রাজার রক্ষা ও শাসকশক্তির প্রতিভূ। মাধ্যন্দিন-সবনে ইন্দ্রের অবিসংবাদিত প্রাধান্য এবং সামগ্রিকভাবে বাজপেয় যজ্ঞে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব এই ইঙ্গিতই বহন করে যে, প্রধানত এটি ক্ষত্রীয়দের যজ্ঞ। বস্তুত, পরবর্তীকালের রাজারাও এই শরৎকালেই ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত সামরিক অভিযানের উদ্যোগ করতেন। বাজপ্রসবীয় বা শক্তিপ্রদ আহুতিদান এবং যজ্ঞের সমাপ্তিতে উত্তেজিত বা বিজয়প্রশস্তি গানের সঙ্গে আহুতিদান এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই যজ্ঞের বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মধ্যে উর্বরতা ও সৌর উপাসনার অবশেষ অনেক পণ্ডিত লক্ষ্য করেছেন।

সৌত্রামণী নামক যজ্ঞেও সুরা নিবেদিত হয় ; সেখানে আহুতি মূলত দুই ধরনের–স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান হিসাবে তাকে 'কৌকিলী' বলে অভিহিত করা হয়েছে, আবার গৌণ অনুষ্ঠানরূপে তা সুরাসক্ত ব্যক্তির জন্য পরিকল্পিত। এই যজ্ঞে ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃষ, সরস্বতীর উদ্দেশে মেঘ, অশ্বীদের উদ্দেশে ছাগ এবং অগ্নির উদ্দেশেও বৃষ বলিদান করা হত। রাজার প্রাধান্য ও আধিপত্যের প্রতীকী ঘোষণারূপে এ অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কিছু অনুপুঙ্খ পরিকল্পিত হয়েছিল।

বাজসনেয়ী সংহিতার তেত্রিশ অধ্যায়ে আলোচিত পুরুষমেধ যজ্ঞটি পরবর্তীকালে সংকলিত হলেও বহু প্রাচীনকালে তার উৎস সন্ধান করা যেতে পারে, যখন পরাজিত শত্রুকে বধ করা হত। কারণ খাদ্য উৎপাদনের সেই স্তরে অর্থাৎ শিকারের পর্যায়ে জীবন্ত শত্রু সমস্যার সৃষ্টি করত, তার জন্য খাদ্য যোগানো উৎপাদনের সেই স্তরে অন্যায় অপচয় ব'লে বিবেচিত হ'ত। নিহত শত্রুর মৃতদেহ বিজেতা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ভক্ষিত হওয়ার পিছনে এই বিশ্বাস সক্রিয় ছিল যে, শত্রুর শক্তি এভাবেই আত্মীকরণ করা সম্ভব। পরবর্তীকালে অবশ্য পরাজিত শত্রুকে পশুপালন বা কৃষিকাজে নিযুক্ত করে অর্থনৈতিক উৎপাদনের অঙ্গীভূত করা হ'ত। শত্রুকে বধ ও ভক্ষণ করার প্রাচীন রীতি লাভজনক নয় বলেই তা ক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে তার স্মৃতি সামূহিক নির্জ্ঞানে গ্রথিত ছিল ; বাস্তব জীবনে পরাজিত শত্রুকে যেহেতু আর তখন হত্যা করা হত না, তাই পুরুষমেধ যজ্ঞ তখন বিশুদ্ধ প্রতীকী অনুষ্ঠানেই পর্যবসিত হ'ল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত বিখ্যাত পুরুষসূক্তের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রকৃতই তাৎপর্যপূর্ণ। অতিজাগতিক স্তরে ঈশ্বরের প্রতিভূ 'পুরুষের আনুষ্ঠানিকভাবে বলিদান ও আহুতি প্রদানের প্রক্রিয়া বিশ্বসৃষ্টির মৌল কারণরূপে এ সুক্তে বর্ণিত। প্রতীকী প্রস্তকথার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন বৃত্তিধারী শ্রেণীকে এই সূক্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য দেবকল্পনাতেও একটি মহাজাগতিক শক্তির প্রতিভুরূপে কল্পিত আদিমতম দেবতার বলিদান বা আত্মবলিদানের দ্বারাই বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, এমন কল্পনা মাঝেমাঝেই পাওয়া যায়। এটি একান্তভাবে বেদেরই বৈশিষ্ট্য নয়।

সর্বমেধ নামক কল্পনাসমৃদ্ধ অনুষ্ঠানটিকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের শেষে যজমান তাত্ত্বিকভাবে তার সমস্ত কিছুই দক্ষিণারূপে প্রার্থীদের অর্পণ করেন। এই ভাবনার সার্বিক বাস্তবায়ীত বিমূর্ত কল্পনা থেকেই আধ্যাত্মিক প্রতীকায়নের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আনুষ্ঠানিক কর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হতে থাকে ও যজ্ঞের অন্তনিহিত মূল আদর্শরূপে আত্মদানের প্রশংসা প্রাধান্য পায়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, সর্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনার মধ্যেই আসন্ন অধ্যাত্মবাদী যজ্ঞ-ব্যাখ্যার ধারক 'ব্রাহ্মণ' ও 'আরণ্যক অংশের প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল। বৈদিক সমাজ তখন প্রকৃত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাথমিক অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত পর্যায় থেকে ক্রমশ সরে গিয়ে সংহিতার শেষে অধ্যায়ে অভিব্যক্তি ঈশোপনিষদের

আধ্যাত্মিক প্রতীকায়িত অবস্থানে উপনীত হচ্ছিল। এতে স্পষ্টতই সর্বমেধের মৌল আদর্শ অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রকাশ স্বীকৃত হয়েছে।

সরলতম ও সংক্ষিপ্ততম অনুষ্ঠান অগ্নিহাোত্রে অবশ্য প্রতীকী দিক দিয়ে মহত্তম যজ্ঞ-ভাবনারই এক অভিব্যক্তি নিহিত আছে, যেহেতু তা প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজিত সাধারণ বিশ্বাস অর্থাৎ বিশ্বজগতে সূর্যদেবের অপরিহার্যতা ও শ্রেষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

সমাজ

যজুর্বেদের মধ্যে উপযুক্ত উপাদানের অভাব থাকার ফলে এর থেকে সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, যদিও এতে মাঝে মাঝে শুচিবৃক্ষ, গোপালায়ন বা ক্ষিপ্রতারীর মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নাম উল্লিখিত। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরবর্তী বৈদিক যুগে কিছু কিছু মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হওয়াতে সামাজিক জীবনের বহুদিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কৃষিব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সমাজের পুরুষশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল এবং এই সময় থেকেই যেহেতু সমাজে নারী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরশীল হতে শুরু করল, তাই সমাজে ক্রমশ তার মর্যাদা হ্রাস পেল। তাছাড়া, আর্য পুরুষেরা প্রায়ই অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত যে সব নারীদের বিবাহ করত, সমাজে তাদের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি না থাকার ফলেও সাধারণভাবে নারীর সামাজিক অবমূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। বারাঙ্গনাদের সাহচর্যলাভে পুরুষেরা যেমন অভ্যস্ত ছিল, তেমনি পরস্ত্রীগমনেও কোনো বাধা ছিল না ; একমাত্র নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠানের দিনে এই ধরনের সম্পর্কে কিছু বাধা ও নিষেধ নির্দেশিত ছিল। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার পর প্রথম দিবসে যজমানের পক্ষে বারবধুর সঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল, দ্বিতীয় দিবসে পরস্ত্রী এবং তৃতীয়ে নিজের স্ত্রীর সাহচর্য নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীকে যদিও অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়েছে, তবুও বারে বারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারী সমাজে সর্বপ্রকারে হীন ব'লেই বিবেচিত ; জনসমাবেশে যোগদানের কোনো অধিকার তার ছিল

না, তেমনি সম্পত্তির অধিকারেও সে বঞ্চিত ছিল। পুরুষের বহুবিবাহকে সমর্থন করা হলেও নারীর বহু বিবাহের উপর কঠোর বাধা-নিষেধ নেমে এসেছিল।

যজুর্বেদের সময়েই জাতিভেদ প্রথা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় ও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ; বিভিন্ন বর্ণের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ধীরে ধীরে কঠোর ও অলঙ্ঘ্যভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বুদ্ধি ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ব্রাহ্মণরা সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করে ; এবং এই ব্রাহ্মাণ সম্প্রদায় ক্রমে জন্মগতভাবে এসব অধিকার আত্মসাৎ করে নেয়। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও পুরোহিতরা সমাজের কাছে সর্বাধিক সুবিধা লাভ বা আদায় করে নিয়েছিল, কেননা যজ্ঞনিষ্ঠ সমাজে যে সমস্ত অনুষ্ঠান অদীক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে সর্বতোভাবে রহস্যাবৃত ছিল, সেইসব অনুষ্ঠানের পরিচালক ব্রাহ্মণরা ত স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিক সম্ভমের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। পুরোহিতদের কর্তব্যের বিভাজন এবং যজ্ঞের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোহিতদেরও সংখ্যা চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রত্যেক বেদের জন্য পৃথক ও সুনির্দিষ্ট পুরোহিত্য-মণ্ডলী বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে তখনকার সমাজে পুরোহিতের বৃত্তিকেই চূড়ান্ত মর্যাদা ও লাভের বৃত্তিতে পরিণত করে।

অধ্বর্যু-শ্রেণীর পুরোহিত যজুর্বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যুদ্ধবিজয়ী রাজাদের হাতে সম্পদ যত পুঞ্জীভূত হতে লাগল ততই পুরোহিতরা নিত্য নুতন যজ্ঞ উদ্ভাবন করে ক্রমশ অধিক-সংখ্যক পুরোহিতের প্রয়োজনকে অনিবার্য করে তুলল। যজুর্বেদে উল্লিখিত বহু-অনুপুঙ্খাযুক্ত শ্রৌত্যযজ্ঞাগুলির মধ্য দিয়ে নানা শুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্থার সূচনা হয়েছিল, যা দুই সহস্রাব্দেরও অধিক সময় ধীরে ভারতীয় সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা যুক্ত হয়ে পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মাচরণকে একটি নুতন চরিত্র দান করে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রাগার্য সিন্ধুসভ্যতায় আচরিত ধর্ম থেকেই সম্ভবত তিনটি ভিন্ন আকৃতির (গোলাকৃতি, ত্রিভূজ ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি) যজ্ঞবেদীর ধারণারূপ লাভ করেছিল। অনুষ্ঠানের নির্দেশাবলী থেকে আমরা তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। গায়ক এবং চিকিৎসকদের সেই সমাজে হীন বলে গণ্য করা হত। জাতিভেদজর্জরিত সমাজে ব্রাহ্মণদের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হওয়ার কারণ এই যে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর্বশেষে আর্যরা বিজয়ীরূপে আর্যাবর্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সামাজিক শ্রেণীরূপে যোদ্ধাদের গুরুত্ব স্বভাবতই খর্ব

হয়ে যায়। সেই কৃষিজীবী ভূমিনিষ্ঠ স্থিতিশীল সমাজে ক্ষত্রিয়দের তুলনায় ব্রাহ্মণরা তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের মঙ্গলবিধান করার দাবিতে সামাজিক গৌরব অর্জন করে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতি-বিভাগের মধ্যে সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা ও চলিষ্ণুতা অবশিষ্ট ছিল বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এবং যে কোনও জাতিভুক্ত কর্মক্ষম সৎ বা বিদ্বান ব্যক্তি সমাজে তার প্রাপ্য সম্মান লাভ করত।

বেদ-রচনার এই পর্যায়েও শতায়ু হওয়াই ছিল মানুষের প্রত্যাশিত সার্থকতা। কৃষি-ব্যবস্থায় লব্ধ উদ্বৃত্ত ধন, গোসম্পদ, কুটীর শিল্প, বাণিজ্য এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে উঠল। তৎকালীন, মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাচীন আর্যরা দিনে তিনবার আহার করতেন। কৃষির প্রসারের যুগে মাংস, দুধ ছাড়াও শস্যজাত ও দুগ্ধজাত খাদ্য, মধু, সুরা ও সোম আহার্য ও পানীয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছিল। তখনকার মানুষ জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিল, তারও বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় থেকেই তপস্যার বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হতে থাকে। বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়ে যেমন যজ্ঞই ধর্মাচরণের ও প্রকৃতির ওপর জয়লাভ করার একমাত্র উপায় ছিল, এখন আর ঠিক তেমন নয় ; তপস্যাও একটি বিকল্প শক্তিরূপে পরিগণিত হতে শুরু করেছে উত্তর বৈদিক যুগের শুরু থেকেই, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ও যজুর্বেদেই এই নূতন বোধের সূচনা। তপস্যা এখন একটি প্রবল সৃষ্টিশীল শক্তি, মহাবিশ্বে সৃষ্টির অন্তরালে নিহিত এ শক্তি।

আঙ্গিক ও ভাষা

তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবৃতি ও ব্যাখ্যার ধরন ভিন্ন ভিন্ন। কখনও কখনও একাদিক্রমে অনুষ্ঠানগুলি বিবৃত হয়েছে, কখনও বা একই অনুষ্ঠান পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রচলিত ভাষার বিশেষ ধরনের প্রয়োগে দৈনন্দিন ভাষার যুক্তি-পরম্পর্য পরিবর্তিত হয়ে আকৃতি ও তাৎপর্যের মধ্যে গূঢ়ার্থবহ প্রতীকী ব্যঞ্জনা দেখা

দিয়েছে। অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপুঙ্খেও প্রতীকধর্মিতা যুক্ত হওয়ার ফলে যজ্ঞধর্ম ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনবৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশেষ ধরনের গূঢ় এক বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। অধ্যাত্ম ব্যাজনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিচিত্র সব প্রস্নকথাও ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হওয়ায় ভাষা অনিবার্যভাবেই বিমূর্তয়িত হয়ে পড়েছে। এই ভাষা প্রকৃতপক্ষে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচনার মধ্যবর্তী যুগসন্ধিক্ষণের ভাষা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ঋগ্বেদের তুলনায় যজুর্বেদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধতির ও উন্নততর ; আর্য উৎস ছাড়াও অনার্য উৎস থেকেও সম্ভবত বিচিত্রতর প্রতিশব্দ গৃহীত হয়েছিল। ঋগ্বেদের ক্রিয়া-বৈচিত্র্য কিছুটা হ্রাস পেলেও যজুর্বেদের পর্যায়ে ক্রিয়াপদের সমৃদ্ধি প্রায় সমতুল্যই রয়ে গেছে। অবশ্য কিছু কিছু নূতন ক্রিয়াপদের সন্ধানও এই যুগেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। তার কিছু বা আহত হয়েছে প্রাগার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রতিবেশীদের শব্দভাণ্ডার থেকে। অন্তর্বিবাহ, বাণিজ্য ও দৈনন্দিন নানা সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবেশীদের শব্দভাণ্ডার থেকে ইন্দো-আর্য ভাষা শব্দ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। এই উত্তর বৈদিক পর্যায়ে বিশেষভাবে। ভাষার দিক থেকেও অনার্য জাতি গোষ্ঠীর কাছে আর্য বৈদিক ভাষার ঋণ নূতন নূতন বৃক্ষ, লতা কিংবা পরাজিত শত্রুর ও যজ্ঞীয় পশুর শারীরিক বর্ণনায় এবং সমাজসংস্থার জ্ঞাপক নানা শব্দে সুস্পষ্ট। মন্ত্রের যে অংশগুলি নিশ্চিতভাবে যজুর্বেদের নিজস্ব, সে সবই সংক্ষিপ্ত ও সূত্রবদ্ধ উচ্চারণখুব কম ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ শ্লোক আমরা পাই। অনুষ্ঠান সম্পর্কিত গদ্যে-বচিত নির্দেশাবলীতেই প্রকৃত পুরোহিত-তন্ত্রের রচনার পরিচয় পাই, যা ঋগ্বেদে প্রাপ্ত কাব্যশৈলী থেকে স্বরূপত ভিন্ন। তাই, ইচ্ছাকৃতভাবে নিগূঢ় রহস্য-বিদ্যা নির্মাণের প্রয়াস স্পষ্টতই পরিস্ফুট হয়েছে তির্যক অর্থ সম্পন্ন বাক্যাংশে, উদ্ভট সমীকরণে ও আপাত অর্থহীন শব্দ দিয়ে রচিত সূত্রগুলিতে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরলতর প্রার্থনাও প্রথিত হয়েছে। সংখ্যা ও ছন্দের পুনরাবৃত্তির মধ্যে একটি রহস্যের বাতাবরণ নির্মাণের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট।

ঋগ্বেদের বহু পরিচিত বাক্যাংশে ও মন্ত্রবিন্যাস ইতোমধ্যে স্তোত্র ও প্রার্থনাগুলির জাদুকরী প্রভাব অর্জন করে নিয়েছে। যজুর্বেদ সংহিতায় এই নতুন মন্ত্রবিন্যাসকে অনুসরণ করা হয়েছে। মৌখিকভাবে রচিত সাহিত্যে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি মন্ত্রের আঙ্গিক ও বিষয়গত তাৎপর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিশেষ একটি ভূমিকা অর্জন করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই নির্দিষ্ট বিন্যাস বার বার অনুসৃত ও সচেতনভাবে পুনরাবৃত্ত হওয়ার ফলে পুরোহিতদের অনেক শ্রম লাঘব হ'ত ; মূলত বিশুদ্ধ আনুষ্ঠানিক

কার্যপদ্ধতি ও মন্ত্র উচ্চারণের প্রয়োজনে শ্রোতাদের মনোযোগ যাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, বহু পরিচিত মন্ত্রাংশের পুনরাবৃত্তি সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই যুগে ইন্দ্রের প্রাধান্য ধীরে ধীরে খর্ব হতে থাকে এবং আনুপাতিকভাবে প্রজাপতির মর্যাদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। সমাজে নূতন চেতনার উন্মেষের ফলে পুরাতন যজ্ঞে নুতন অনুপুঙ্খ যুক্ত হয় কিংবা সম্পূর্ণ নুতন যজ্ঞ এবং তৎসম্পর্কিত প্রস্নকথা উদ্ভাবিত হতে থাকে। লোক ধর্মের অনেক উপাদান বিভিন্ন অনুপুঙ্খে আবিষ্কার করা যায়। বহুক্ষেত্রে আদিম ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের অবশেষও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তৎকালীন ভাষায় আধ্যাত্মিক প্রতীকধর্মিতা ও রূপকধর্মী প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়। গভীর দ্যোতনা-যুক্ত বিশিষ্ট বাক্যাংশ আনুষ্ঠানিক পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে সমগ্র সমাজের নিকট ধর্ম সাহিত্য-রূপে সম্মানিত হত। পুরোহিত রচয়িতাদের প্রজন্ম-পরম্পরা যজ্ঞধর্মে কার্যকরী ও স্মৃতিতে ধারণ করার যোগ্য যে নির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত ভাবরীতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, তা সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। মৌখিক সাহিত্যের বিশিষ্ট চরিত্র-লক্ষণ বাচনিক কাঠামোতো পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পুনরাবৃত্তি 'যেমন স্মৃতিসহায়ক ও ঐন্দ্রজালিক প্রভাবযুক্ত বাকরীতি রূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি তাদের মধ্যে স্থাপত্যসুলভ অন্তর্লীন গঠনগত ঐক্যের বোধও অভিব্যক্তি। একই ধর্মবিশ্বাসগত উত্তরাধিকারের প্রতি সমাজের আনুগত্য যেমন স্তোত্রের পুনরাবৃত্ত অংশগুলির মধ্যে আভাসিত হ'ত।

ঋগ্বেদীয়পদ্যের মতোই যজুর্বেদের গদ্যভাষা শ্বাসাঘাতযুক্ত স্বরে গ্রথিত, ফলে তা কানে শুনে স্মৃতিতে ধারণ করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শুধু শ্বাসাঘাতের জন্যই নয়, গদ্য কাঠামোটি বহু ক্ষেত্রেই পদ্যের আঙ্গিকেরই অনুকরণ। অনুপ্রাসযুক্ত শব্দ ও বাক্যাংশ নির্দিষ্ট দূরত্বে সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে ছন্দোময়তা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ ভঙ্গিতে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বাচনিক পুনরাবৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে অভিনব সূত্রাকৃতি রচনাশৈলীর সৃষ্টি হয়েছে। এতে সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত হয়, যাতে কন্ঠস্থ করা ও স্মরণে রাখা সহজ হয় ; ফলে, যজ্ঞে প্রয়োগও অনায়াসে বা স্বল্পতর আয়াসে সাধিত হয়। এ ধরনের গদ্যভাষার বিষয়বস্তু মোটামুটি দুই ধরনের : (১) ক্রিয়াপদহীন, সংক্ষিপ্ত, প্রায় গূঢ়ার্থযুক্ত, ছন্দযুক্তিবদ্ধ সূত্রায়িত মন্ত্রসমূহের আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ–আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বাকবিস্তার বলে মনে হলেও আনুষ্ঠানিক আচার ও ভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে তাতে কিছুটা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর। শৈলীগত বিচারে

নিরলংকার ও ব্যবহারিক হলেও এর মধ্যেই আমরা সংস্কৃত গদ্যের প্রাথমিক নিদর্শন খুঁজে পাই। (২) প্রস্তকথাগুলি যে ধরনের গদ্যরীতি বিবৃত হয়েছে তা কতকটা ভিন্ন। শৈলীগত বিচারে স্বল্প শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা এর মধ্যেও লক্ষণীয়, যদিও এতে ক্রিয়াপদ একেবারে অনুপস্থিত নয় এবং বাচনিক কাঠামোও কিছুটা কম গ্রন্থিল। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ-যোগ্যতা পরীক্ষা করার সুযোগ থাকায় এবং একই সংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করার ফলে যজুর্বেদের গদ্যভাষার মধ্যে উপলব্ধির প্রত্যক্ষতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত, প্রাথমিক গদ্যের মাত্র দুটি উদ্দেশ্যই ছিল : যজ্ঞানুষ্ঠানের নির্দেশাবলী প্রণয়ন এবং তৎসম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা। ভাষ্যে অন্যান্য বিষয়ও যুক্ত হয়েছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পক্ষে যাদের গুরুত্ব অনেক। কখনও কখনও যজ্ঞে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ বা আনুষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতিকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করার সচেতন প্রচেষ্টা হয়েছে। ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই রচনাশৈলী। আপাতদৃষ্টিতে অনাবশ্যকভাবে ও অত্যধিক পরিমাণে কর্কশ, উচ্চাবচতাহীন, একঘেয়ে, নিষ্প্রাণ ও অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আকস্মিকভাবে কখনও কখনও দু একটি শ্লোক সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠানসর্বস্ব গদ্যের একঘেয়ে গতানুগতিকতায় স্বল্প-পরিমাণ বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়েছে ; কিন্তু এই সব শ্লোকও কাব্যের প্রয়োজনে আসে নি, এসেছে পুরোহিতের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে। অধিকাংশ শ্লোকই ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি ঋণরূপে গৃহীত হয়ে যাজ্য বা অনুবাক্যা বা অন্য কোনও যজ্ঞকর্মের অঙ্গরূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

রচনাশৈলীর মূলগত কর্কশতা সত্ত্বেও কিছু পদ্যাংশে যৎসামান্য কাব্যিক অভিব্যক্তির নিদর্শন রয়েছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি অতি সাধারণ আলংকারিক অনুপুঙ্খ, প্রাথমিক স্তরের উপমা ও রূপকের স্তর থেকে উন্নততর কোনো পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। ফলে, প্রায় সম্পূর্ণতই প্রকৃত কাব্যিক আবেদন সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধিকাংশ উপমা ও রূপকের উদ্দেশ্য কোনও একটি আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। তবুও এদের মধ্যেই দৈনন্দিন জীবন থেকে সংকলিত উপমার পরিচ্ছন্নতা ও অন্তর্লীন শক্তি আমাদের মুগ্ধ করে। কিছু কিছু চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আমরা সহসা তৎকালীন জনসমাজের ব্যবহারিক বাস্তব জীবন সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারি। উপমা, রূপক এবং চিত্রকল্পের প্রয়োগে হয়ত ঋগ্বেদের মন্ত্রের তুলনায় কল্পনাসমৃদ্ধির অভাব আছে ; তবুও, অনুষ্ঠান-নির্ভর সাহিত্যে ব্যবহারিক প্রয়োগের

মধ্যে যথেষ্ট কার্যকরী বাককুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুপ্রাসযুক্ত মন্ত্রের অধিকাংশ ঋগ্বেদ থেকে সরাসরি উদ্ধৃত হয়েছে, যেহেতু সেগুলি সহজেই কন্ঠস্থ করা যায়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে যজুর্বেদের নিজস্ব অনুপ্রাস নির্মাণের নিদর্শন পাওয়া যায়, সেখানে সে সব শুষ্ক ব্যবহারিক এবং সম্পূর্ণত আনুষ্ঠানিক রচনার তাৎপর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে, আলংকারিক ও কাব্যিক মণ্ডনের তাগিদে নয়। বস্তুত, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ-সমুহে এ জাতীয় রচনায় অলংকার মূলত স্মৃতির সহায়ক।

ইন্দ্রজাল

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্রজালের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যজুর্বেদ সংহিতার বহুস্থানে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন উল্লেখ রয়েছে, তবে মঙ্গলপ্রদ ইন্দ্রজাল ও অশুভাপ্রসূ জাদুবিদ্যার মধ্যে ব্যবধান খুব কম, কেননা বহুক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খগুলি এমনভাবে বিবৃত হয় যে, শত্রুকে পর্যুদস্ত করার প্রয়োজনে আরও একটি পাল্টা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। যজ্ঞীয় মন্ত্রগুলির অর্ধস্ফুট উপাংশু জপের পদ্ধতি দানব-শক্তির পরাজয়ের সময় আবিষ্কৃত হয়েছিল, এইরূপ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যজ্ঞে উপাংশু জপ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত দানবেরা দেবশক্তির সঙ্গে সফলভাবে সংগ্রাম করেছিল। বলা বাহুল্য, যজমানের অনুষ্ঠানের প্রণালী গোপন করার এই প্রবণতাকে ইন্দ্রজালের সঙ্গেই মূলত সম্পৃক্ত ; পুরোহিত সম্প্রদায়ের এই প্রবণতাকে উপযুক্ত প্রত্নকথার মাধ্যমে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই ছদ্ম আপাত যুক্তিকে যজ্ঞধর্ম পালনের সমর্থনে সত্য যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে যাতে আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিহীন আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খ ও নৈসর্গিক জগতের সঙ্গে কোনো এক কাল্পনিক স্তরে সমন্বিত হতে পারে।

বৈদিক ছন্দের সঙ্গে যজ্ঞ ও যজ্ঞালব্ধ সুফলের অন্তর্গঢ় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং অতিজাগতিক তাৎপর্যযুক্ত ঐন্দ্রজালিক গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ বিবৃতি পাওয়া যায়। একটি মৌল বিশ্বাস ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে যে, ইহজগতে আয়োজিত যজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সৃষ্টিতে অদৃশ্যভাবে নিয়ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ; সৃষ্টিকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে মানুষ

বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত একটা মহাজাগতিক যজ্ঞকেই অনুকরণ ক'রে চলেছে। মানবিক প্রকৃতি এবং মানুষের বিচিত্র সামাজিক বৃত্তিকে প্রায়শই বিভিন্ন প্রত্নকথার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"কিক্কিটা" শব্দটিকে একটি রহস্যময় উপাদান রূপে যজ্ঞীয় পশুর মন, চোখ, কান ও বাক-এর সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। কীথ মনে করেন যে, এই শব্দটির ধ্বনিগত বিন্যাসে গবাদিপশুকে আহ্বানসূচক বিশেষ ধ্বনির প্রতিধ্বনিই রয়েছে। যজুর্বেদ সংহিতায় এই শব্দটিকে জনপ্রিয় ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বৈদিক ছন্দের মধ্যেও জাদুশক্তির অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল। অক্ষর বা চরণের সংখ্যা প্রাকৃতিক কোনও বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই সম্পর্ক-কল্পনার মধ্যেই যজ্ঞানুষ্ঠানের রহস্যময় উপযোগিতা বা ছন্দের প্রচ্ছন্ন শক্তি নিহিত। বৈদিক সমাজে এইরূপ ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের অতিপ্রাকৃত তাৎপর্য সুস্পষ্ট। সামবেদে এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর এবং ছন্দোগ্য ব্রাহ্মণে তা যথার্থই সর্বাতিগ প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করেছে। পরবর্তী সাহিত্যে সোমযাগের গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের গৌরবও বর্ধিত হয় এবং সেই সঙ্গে সামবেদের মহিমা উত্তরোত্তর দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সোমযাগকে পরিকল্পিতভাবে রহস্যনিবিড় স্তরে উন্নীত করার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রেই অতিজাগতিক প্রতীকায়নের প্রবণতা দেখা দেয়। যৌথ-অবচেতনায় প্রত্নপৌরাণিক যুক্তি অনুযায়ী অগ্নি-ছন্দগুলিকে বস্ত্রের মতো ব্যবহার ক'রে নিজেকে আচ্ছাদিত করেন; সহজ কথায় ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রে অগ্নি প্রশংসিত হন ; অগ্নির সঙ্গে ছন্দগুলির এইরূপ সম্পর্কের উপলব্ধির জন্যই উপাসক বস্ত্র লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। মহাকালের সূচনা-পর্ব থেকেই দেবগণ মানবজাতির প্রতি নানা ধরনের কৃপা বর্ষণ করছেন বলে তাদের শক্তি ও সারাৎসার এই প্রক্রিয়াতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কখনও কখনও এই তথ্যকে দেবতাদের অঙ্গহানির প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দেবতাদের এইসব হারানো অঙ্গ বা শক্তিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কয়েকটি বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞধর্মের সামগ্রিক ভাবাদর্শের উপর এ জাতীয় প্রত্নকথার প্রভাবে যজমানে যেন এক অতিপ্রাকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন, কেননা হারানো শক্তিকে সত্বর পরিপূরণ না করা হলে সৃষ্টির ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই যজমান যখন পুরোহিতের সাহায্যে যজ্ঞ করে দেবতার অঙ্গহানির প্রতিষেধ করেন, তখন মহাবিশ্বের পটভূমিকায় যজ্ঞক্রিয়াটি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সুতরাং

ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের অগ্রগামী যজুর্বেদের পর্যায়েই যজ্ঞ অধ্যাত্মচিন্তার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ধীরে ধীরে সাধারণভাবে যজ্ঞধর্ম ও বিশেষভাবে আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খগুলি সংশয়াতীতভাবে সামাজিক মননের মূল স্রোতে এসে মিশে যায়।

অধিকাংশ প্রত্নকথা তার স্বভাববৈশিষ্ট্যেই হেতুসন্ধানী, কিন্তু প্রায়ই সেসব যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সংলগ্ন হয়ে থাকে। কদু এবং সুপর্ণীর বিখ্যাত প্রত্নকথায় বৈদিক ছন্দগুলির বিশেষ ভূমিকা কল্পিত হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্য একটি প্রত্নকথার গন্ধর্ব বিশ্বাবসু কর্তৃক অপহৃত সোম উদ্ধারের জন্য দেবতারা বাগদেবীকে প্রেরণ করেন, বাগদেবী গন্ধর্বদের সংগীত ও নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হলেন ; ফলে, এই প্রত্নকথার উপসংহারটি আমাদের প্রত্যাশার বিপরীত। যক্ষ্মারোগের উৎস বিষয়ক একটি প্রত্নকথা আমরা পাই বা পরবর্তীকালে মহাভারত এবং পুরাণসমূহে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এ ধরনের প্রত্নকথায় একই সঙ্গে বহু উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যক্ষ্মারোগের হেতুসন্ধান ছাড়াও বহুবিবাহ প্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতনতা যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভের প্রয়োজনে আদিত্যদেবের উপাসনার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে আমরা একদিকে সৌর দেবতাদের সঙ্গে আরোগলিপ্সু ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলির সম্পর্কের কথা স্মরণ করতে পারি, অন্যদিকে পরবর্তী সাহিত্যে সূর্যদেবের সঙ্গে চিকিৎসার সম্পর্ক বিষয়েও অবহিত হই।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আমরা সর্বপ্রথম ত্রিপুরদহন বিষয়ক বিখ্যাত দেবকাহিনীটির সন্ধান পাই, যেখানে শিবের একটি মাত্র বাণ নিক্ষেপ তিনটি দৈত্যপুরী যুগপৎ ধ্বংস হওয়ার বিবরণ রয়েছে। এই কাহিনীর সঙ্গে উপসৎ অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে এবং এতে সেই সঙ্গে দেবতাদের আশীর্বাদে রুদ্রের 'পশুপতি' অভিধা লাভের কাহিনীও বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য কাহিনীটির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের বরাহবধের কাহিনীও উল্লিখিত : দর্ভজাতীয় কুশগুচ্ছের সাহায্যে ইন্দ্র সপ্তপর্বত ভেদ করে দানবকে বধ করেছিলেন এবং যে যজ্ঞ পলায়ন করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল বিষ্ণুরূপ ধারণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। এই প্রত্নকথার উপসংহারে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে যে পৃথিবী প্রাথমিক অবস্থায় অসুরাদেরই করায়ত্ত ছিল,–ইন্দ্র দেবতাদের প্রতিনিধিরূপে অসুর-ভূমিকে সবলে অধিকার করেছিলেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী অসুর বা সিন্ধু-উপত্যকা-নিবাসীদের পরাভূত করেই যে আর্যরা নিজেদের

বসতি বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা একটি রূপকের দ্বারা যেন এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শিবকে কেন্দ্র করে বীরত্বমূলক উপাখ্যান ঈঙ্গিতভাবে গড়ে ওঠে নি বলেই সম্ভবত তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়োজনে ত্রিপুর-দহনের প্রত্নকথা কল্পিত হয়েছিল। ছলনার মাধ্যমে প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর ভূ-সম্পদ আর্য আক্রমণকারীরা কীভাবে আত্মসাৎ করত তার ইঙ্গিত রয়েছে সালাবৃকী বিষয়ক প্রত্নকথায় ফেল গানে ইন্দ্র সালাবৃকীরূপে দৌড়ে অসুরদের প্রতিশ্রুত ভূমিভাগ অর্থাৎ সমগ্র অসুরভূমি আত্মসাৎ করেন। তেমনি ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রয়োগের নিদর্শন রয়েছে ইন্দ্র কর্তৃক বরাহ-নিধনের উপাখ্যানে। এছাড়া, আমরা একটি বিচিত্র অর্থযুক্ত সংক্ষিপ্ত সৃষ্টিতত্ত্বমূলক কাহিনীর সন্ধান পাই যেখানে অগ্নিদেবের অতিজাগতিক ও সৃজনশীল ভূমিকা বিবৃত হয়েছে। বাস্তবজীবনে সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্নির অনিবার্য ভূমিকা আর্যরা লক্ষ্য করেছিলেন। মানুষের প্রথম ধর্মীয় আচরণের, অর্থাৎ যজ্ঞের, সঙ্গে অগ্নিই একমাত্র নৈসর্গিক উপাদানরূপে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষের বন্ধুরূপে অগ্নির অন্যান্য যে ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা হল নিশ্চিত শস্য সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও বহু সন্তান উৎপাদনে সহায়কের ভূমিকা। প্রথম অগ্নি-উৎপাদনক ও কার্য-বিধায়ক গোষ্ঠীর দৈব প্রতিরূপ হিসাবে 'সাধ্য'গণ পরিকল্পিত হয়েছিল। একই প্রত্নকথায় অগ্নিকে সেই পুরুষের পদবী দেওয়া হয়েছে, যিনি নিজেকে আত্মযজ্ঞে সমর্পণ করে বিশ্বসৃষ্টি সম্পাদন করেন।

কোনও প্রাগার্য সংসার-বিমুখ, ভ্রমমান সাধক-গোষ্ঠীর প্রতি ইন্দ্রের নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার আভাস রয়েছে একদল 'যতি'কে সালাবৃকদের কাছে সঁপে দেওয়ার

নিষ্ঠুর কাহিনীতে।

যজ্ঞীয় আহুতিগুলির মধ্যে 'ইলা' বা 'ইড়া" (যজ্ঞভাগ) বিশেষ পবিত্র বস্তু। দুটি পরস্পর সংবদ্ধ উপাখ্যানের মধ্যে এই পবিত্রতার কল্পনাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। পূষা ভ্রান্তিবশে সাধারণ খাদ্য ভেবে কঠিন ইড়াকে চর্বণ ও ভক্ষণ করতে গিয়ে দন্তহীন হয়ে পড়েছিলেন। বৃহস্পতি যজ্ঞের পবিত্রশক্তির ধারক ; বিশ্বজগতের সর্বত্রগামী চক্ষু, অর্থাৎ

সূর্যের মাধ্যমে তিনি ইলার দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও অন্যান্য দেবতাদের মতো অগ্নির মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করেন। এই প্রত্নকথার আহূতির মৌলরূপটি পরিবর্তিত হয়ে একটি সর্বাতিশায়ী দৈব-শক্তির প্রতিনিধিতে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের প্রত্নকথার সাহায্যে যজ্ঞ বিষয়ে যথার্থ ও অনুষ্ঠানগতভাবে প্রত্যয়সিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যেই যজ্ঞ নিত্যনূতন মাত্রা, মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই যজুর্বেদের অন্যতম প্রধান অবদান।

যদিও অধিকাংশ প্রত্নকথাই চরিত্রগতভাবে হেতুসন্ধানী, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব কাহিনীর মধ্যে দেবতাদের প্রতি নুতন এক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া যায়। এগুলি প্রধানত সাতটি ধারায় বিভক্ত। যেমন-(১) কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে একক দেবতার অসামর্থ্যের ফলে একটি বিশেষ বাধা অতিক্রম করার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কোনো অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সূর্য, বরুণ ও অশ্বীদের সম্পর্কে এ জাতীয় কিছু দেবকাহিনী প্রচলিত রয়েছে। (২) কিছু কিছু দেবকাহিনীতে একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবতারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনো কার্যসাধনে ব্রতী হয়েও ব্যর্থ হলেন, পরে প্রজাপতির কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি তাদের নির্দিষ্ট একটি যজ্ঞ সম্পাদন করতে নির্দেশ দেন। তবে এ জাতীয় প্রত্নকথা এখনও বিরল, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। (৩) কোনও কোনও প্রত্নকথা প্রায়শ্চিত্তমুলক-যজ্ঞকর্মে ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য ও ভ্রান্তিজনিত পাপক্ষালনের প্রয়োজনে এগুলি রচিত। তবে, পরবর্তী ব্রাহ্মণসাহিত্যে আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তের ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ যজুর্বেদ সংহিতায় ততটা নয়। (৪) কিছু কিছু নিবৃত্তিমূলক ও স্বস্তিবাচক কাহিনীও গড়ে উঠেছে, মুখ্যত অদিতি, ইন্দ্র ও রুদ্রকে কেন্দ্র করে। (৫) কখনো কখনো অনুষ্ঠান বা যজ্ঞীয় অনুপুঙ্খকে মহিমান্বিত করার প্রবণতা এ কাহিনীগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। আদিত্যদের অঙ্গিরসের দ্বারা অগ্নিচয়ন, দর্শপুর্ণমাস যজ্ঞের আয়োজন ইত্যাদির বিবরণে এর নিদর্শন রয়েছে। (৬) কখনো বা সমস্যা নিরসনের চতুর কৌশলরূপে কোনও কোনও প্রত্নকথা প্রযুক্ত হয়। উদাহরণরূপে বিষটু উচ্চারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র কাহিনীটির উল্লেখ করা যেতে পারে। (৭) কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি বিস্ময়কর কিছু কাহিনীতে পরিস্ফুট হয়েছে। তাই কোথাও বা দেখা যায় যে, সমস্ত দেবতাই বৈরি জনগোষ্ঠীরূপে আকস্মিকভাবে চিত্রিত হয়েছেন যাদের কাজ হ'ল মানুষের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে তাদের বিভ্রান্ত করা। সম্ভবত, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,

ইতোমধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যয়ে, জটিলতায় ও নিয়মের ক্রমবর্ধমান বাহুল্যে দুর্বহ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কেবলমাত্র অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিই তখন যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারতেন। ফলে, সাধারণ মানুষ নিতান্ত দর্শক হিসেবে দেবতাদের দেখতে পেতেন অত্যাচারী ও মানুষকে পীড়ণ করে হব্য আদায় করার ভূমিকাতে। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞও তাদের কাছে ঈঙ্গিত ফলদানে অসমর্থ ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছিল, কারণ যজ্ঞ করে অভীষ্ট ফললাভের ব্যর্থ মানুষের অভিজ্ঞতায় জমা হচ্ছিল ক্রমেই। দেবতাদের যেখানে যজ্ঞের বিধ্বংসী এবং অপহারক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে রচয়িতার প্রকৃত অভিপ্রায় সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। সম্ভবত, এব মধ্যে আমরা বিচ্ছিন্নতাবোধ, অবিশ্বাস এবং দৈব প্রতারণা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা লক্ষ্য করতে পারি। যদিও এই অংশটি যে শাস্ত্র সংকলনের সময় বর্জিত হয় নি সেটার বিস্ময় থেকেই যায়। যে সোমযাগ ক্রমশ বর্ধিত গুরুত্ব অর্জন করেছিল, তার সপ্রশংস উল্লেখ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল ব'লেই সম্ভবত এই আপাত-বিরোধী অংশটি পরিত্যক্ত হয় নি।

কখনো কখনো প্রত্নকথার মধ্য দিয়ে কোনও বিকাশোন্মুখ ভাবাদর্শ বিশ্লেষণের উপযোগী অন্তদৃষ্টি আমরা লাভ করি যা পববতী সাহিত্যে ক্রমে প্রধান আধ্যাত্মিক প্রবণতারূপে পবিণতি লাভ করেছে। যেমন নির্বাণোন্মুখ গার্হপত্য অগ্নির পুনর্নবীকরণের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করার সময় তাকে জীর্ণ নির্মোকযুক্ত সর্পের সঙ্গে সুসংগত একটি প্রত্নকথায় কথিত হয়েছে যে, বভ্রুপুত্র কসর্নীর যথোপযুক্ত ইন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল যার সাহায্যে সে নতুন নির্মোক লাভ করতে পারে। পরবর্তীকালে এই চিত্রকল্পই আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির যে তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে ভগবদগীতার একটি বিখ্যাত শ্লোকে। সেখানে আমরা সেই মানুষের মৃত্যুহীন ভাবমূর্তি দেখতে পাই, যে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করার মতোই মৃত্যুকালে শরীর ত্যাগ করে। ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য 'এপিক অব গিলগামেশ'-এ অনুরূপ রূপটিই ব্যবহৃত হয়েছে। গিলগামেশা মহাকাব্যে মানুষের অমরত্বের জন্য আহৃত অমৃত হঠাৎ পান করে সাপ নির্মোক ত্যাগ করে নবজীবন লাভ করে। বস্তুত, জন্মান্তরে দেহান্তর-প্রাপ্তির কল্পনার পশ্চাতে যে সাপের মোক-মোচনই রয়েছে এতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং প্রত্নকথাগুলি বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে, বহু ভিন্ন ভিন্ন সচেতন ও অবচেতন দাবি-পূরণ করতে গিয়ে, বিচিত্র আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের আপাত-যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নির্ণয় করেছিল। এই সব প্রত্নকথা সামাজিক আচারকে যুক্তিগ্রাহ্য করে, সামূহিক বা ব্যক্তিগত

দুর্ভাগ্যকে নিবারণ করে, দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান করে তাদের গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন করে তোলে, আনুষ্ঠানিক ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে এবং ব্যক্তিগত দৈব-দুর্বপাকের প্রতিবিধান করে। কখনও বা প্রত্বকথার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রতিফলিত হয়। যমের আধিপত্য, স্বর্ণের অমরতা এবং সত্র, দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যে ভাবনা ব্যক্তি হয়েছে, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি বস্তুনিষ্ঠ পরিপ্রেক্ষিত।

আনুষ্ঠানিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রত্নকথাগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের বিচিত্র ভূমিকা পালন করে। কোনও কোনও প্রত্নকথায় যজমান ও পুরোহিতের কাছ থেকে যজ্ঞের পলায়ন এবং যজমান ও পুরোহিতের অন্বেষণ ও পরে শর্তাধীন প্রাপ্তি বর্ণিত। প্রতি ক্ষেত্রেই এই প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত কোনো একটি অনুপুঙ্খ এর পরে যজ্ঞে সন্নিবেশিত হয়। এইভাবেই কাহিনীর মধ্য দিয়ে যজ্ঞেরা জটিলতা ও নব নব অঙ্গবিন্যাস ঘটে। এটা ঘটে যজ্ঞানুষ্ঠান ক্রমশ জটিল, ব্যয়সাধ্য, বহু পুরোহিত-নির্ভর ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার যুগে। তখন যজীৱীয় পুরোডাশ ও উষ্ণ বেদীয় সঙ্গে যথাক্রমে কচ্ছপ ও সিংহীকে উপমিত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, অগ্নি, রুদ্র বা বিষ্ণুর যজ্ঞভূমি থেকে পলায়ন বা যজমানদের কাছ থেকে আত্মগোপন করাও বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞীয় আহুতি প্রদানে বা বিশেষ কিছু মন্ত্র উচ্চারণে বা নির্দিষ্ট ছন্দে মন্ত্র-প্রস্থনায় কিংবা পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের শর্তে সেই দেবতা শেষ পর্যন্ত যজ্ঞে অংশগ্রহণে সম্মতও হয়েছেন। এসব কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজে সুবিধাভোগী কিছু ব্যক্তির মান-অপমান বোধ ও তাদের প্রতি উদ্দিষ্ট স্তাবকতা। তৃতীয়ত, দেবতা ও অসুরদের চিরকালের সংগ্রাম, অনিবার্যভাবে দেবতাদের পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জয়লাভ সুনিশ্চিত হওয়া ইত্যাদিও কিছু কিছু প্রত্নকথায় লক্ষ্য করা যায়। কোনো নবাবিষ্কৃত অনুষ্ঠানের অপরিহার্যতা ও উপযোগিতাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্যই এগুলির সৃষ্টি। চতুর্থত, দেবতাদের সঙ্গে অসুর বা অন্যান্য তির্যক-যোনির প্রতিযোগিতাও বর্ণিত হয়েছে-এইসব ক্ষেত্রে কোনো কোনো অনুষ্ঠানের নিয়ামক ভূমিকা লক্ষণীয়। পঞ্চমত, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী প্রত্নকথার মাধ্যমে আপাতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও চোখে পড়ে, যে গৌণ কোনো আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। ষষ্ঠত, কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রত্নকথা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে আপাতভাবে অনুষ্ঠানটির

যৌক্তিকতা বিধান করে। যেমন বলা হয়েছে, দীক্ষিত ব্যক্তির নিন্দ্রামগ্ন হওয়া উচিত নয়, যেহেতু নিদ্রিত যজমানকেই রাক্ষসেরা আক্রমণ করে থাকে। সপ্তমত, কিছু কাহিনীর মাধ্যমে সামাজিক আচার ব্যবহারও ব্যাখ্যাত হয়। বহুবিবাহ প্রথা, পত্নীকে প্রহার করার প্রচলিত ব্যবস্থা, যজ্ঞে নারীদের যোগদানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক নিষেধ, যজ্ঞের দক্ষিণা, চিকিৎসকদের উপর সামাজিক তাচ্ছিল্যসূচক বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি নিশ্চিতভাবেই বিবিধ অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানেব পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল ; কিন্তু এখন সেইগুলি প্রত্নকথার মধ্য দিয়েই যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত ও জনসমাজে সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য ও নির্বিচারে আচরণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে এসব কাহিনীর অবতারণা করে। সামাজিক ও মানবিক স্তর থেকে পবিত্র অনুষ্ঠানের স্তরে উন্নীত করে এই সব ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত ও তর্কাতীত রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অষ্টমত, কিছু কিছু শব্দের কাল্পনিক বুৎপত্তিকে সমর্থন করার প্রয়োজনে কিছু কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। বহু ক্ষেত্রেই এই সব ব্যুৎপত্তি শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সময়সীমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো ধূসর প্রত্ন-পৌরাণিক অতীতে উপনীত হয়েছে। এই প্রবণতার সঙ্গে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের পরোক্ষ সম্পর্ক অনুমেয়। পরিশেষে বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী, উপকাহিনী গড়ে উঠেছিল ভিন্ন ধরনের বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সাম্য বা একাত্মতা কল্পনার মধ্যে দিয়ে। যেমন রুদ্রই অগ্নি মৃত্যু ব্রহ্মরই রূপ যজ্ঞ বেদীতে স্থাপিত অগ্নি প্রকৃতপক্ষে নিত্রিত সিংহ, সিন্ধুরা বরুণের পত্নী, ব্রহ্মা দেবতাদের বৃহস্পতি, বরুণই দুর্বাক ইত্যাদি। স্পষ্টতই এ ধরনের সমতা স্থাপনের প্রবণতা মূলত পৌরাণিক এবং নিতান্ত পরোক্ষভাবে আনুষ্ঠানিক।

বিশ্বাসকে স্পষ্ট করাই এগুলির লক্ষ্য। স্বাভাবিকভাবেই সমতা বা একাত্মতা স্থাপনের প্রবণতা সর্বদা একইভাবে উপস্থিত নয়, ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী এবং অনুষ্ঠানে এগুলির রূপও ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্নকথাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধান করা বৃথা ; একসঙ্গে একটিমাত্র উদাহরণকে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ব্যাখ্যার প্রয়োগ হয় এবং ঠিক তার জন্ম কাোনাো স্পিনের জন্য সামবাোহের নতুন এক সূত্র সন্ধান অনিবার্য হয়ে পড়ে।

অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশ রুদ্রহাোম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা বিখ্যাত শতরুদ্রীয় এর অন্তর্ভুক্ত। রুদ্রহাোম এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ; শেষের দুটিতে রয়েছে রুদ্রের প্রতি নিবেদিত ঋক ও যজুমন্ত্রসমূহ। প্রথম অধ্যায়ে রুদ্রের প্রসন্নতা

অর্জনের উদ্দেশ্য প্রধুক্ত মন্ত্র এবং দ্বিতীয় থেকে নবম অধ্যায়ে দুই বা এক অর্ঘ্যযুক্ত রুদ্রপ্রশস্তি রয়েছে। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক অনুপুঙ্খের মধ্যে রুদ্রের ক্রোধ প্রশমনের আকাঙক্ষাই মূর্ত হয়ে উঠেছে—শতরুদ্রীয় সূক্তে রুদ্র শতাধিক নাম বা বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন। বস্তুত, সমস্ত প্রাচীন প্রত্নপুরাণের সাধারণ চরিত্রলক্ষশই হ'ল অসংখ্য প্রায়োগিক গুণ ও নামে অলংকৃত করে পূজাহঁ দেবতার বলদৃপ্ত ও শক্তিমান ভাবমূর্তি রচনার প্রবণতা। বিভিন্ন মন্ত্র বিশ্লেষণ করে রুদ্রদেবের আর্য ও অনার্য উৎসের ইঙ্গিত প্রবল হয়ে ওঠে। যদিও আমাদের কাছে কোনও সুস্পষ্ট নিদর্শন নেই, তবুও অনুমান করতে বাধা নেই যে, ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেও বৈদিক আর্য ধর্মবোধ অর্থাৎ বৃহৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির অর্থাৎ লঘু ঐতিহ্যের সহাবস্থান সম্ভব ছিল। রুদ্রের প্রাথমিক উৎসস্থল অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে থাকলেও ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদে যজ্ঞানুষ্ঠানকে নিষ্কণ্টক করার প্রয়োজনে আর্যরা বিশেষভাবে তার প্রসন্নতা কামনা করেছেন। পরবর্তী বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে যে সংশ্লেষণ ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলছিল, যজুর্বেদে তারই সূচনা লক্ষ্য করি। অন্তরঙ্গ নিদর্শন থেকে মনে হয় যে, রুদ্র জনপদ বা গ্রামের দেবতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন নির্জন অঞ্চল ও দূরবর্তী নদী ও জলস্রোতের দেবতা। সম্ভবত, তিনি মূলত অরণ্য থেকে কাষ্ঠ সমিধা ও জল আহরণকারী শূদ্র এবং ব্রাত্যদের দেবতা। এছাড়া, রুদ্রকে বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণ এবং বহু বিচিত্র জীবিকার ব্যবস্থাপকররূপে বন্দনা করা হয়েছে। এই সব জীবিকার মধ্যে এমন কিছু কিছুও রয়েছে যা আর্য ধর্মবোধ অনুযায়ী দেবতার উপযুক্ত নয়–সম্ভবত, আদিম অধিবাসীদের প্রতি আর্যদের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণাই এতে প্রকাশিত। আর্যবসতি থেকে দূরে এইসব নীচ, অবহেলিত ও অশুচি বৃত্তিজীবীরা নির্বাসিত হয়েছিল বলেই তাদের দেবতা রুদ্রের বিষয়ে পড়ি যে, তিনি অরণ্যে, পর্বতে ও নির্জন অঞ্চলে চির ভ্রমমাণ। আর্যমানসে শত্রুর চতুর কৌশল ও নিজেদের সাময়িক কিছু পরাজয়ের স্মৃতি জাগারুক ছিল বলেই এবং জয়ের পরে সমৃদ্ধতির আর্যপল্লীতে প্রত্যন্তবাসী প্রাগার্য মধ্যে মধ্যে হানা দিত বলে অনার্যদের দাসু, প্রতারক, তস্কর ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে অনার্যরা বাধ্য হয়ে যে লুণ্ঠনের আশ্রয় নিত, তারও ইঙ্গিত রয়েছে বর্ণনায়। বহু ক্ষেত্রে রুদ্রের প্রশস্তি-বাচক বিশেষণে যে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। বিজয়ী আর্যদের নিকট স্বভাবতই পরাজিত জনগোষ্ঠী নামহীন জনতারূপে প্রতিভাত হত, যদিও ঋগ্বেদে গোষ্ঠীপতিদের কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি জীবিকার উল্লেখ রয়েছে: দ্বারপাল, শিকারী, কুকুর-পালক,

দারুশিল্পী, রথনির্মাতা, কুম্ভকার, ধাতুশিল্পী প্রভৃতি। সম্ভবত, এদের মধ্যে সিন্ধু-উপত্যকার উৎকৃষ্ট কারুশিল্পীর পরিচয়ও নিহিত, যাদের প্রতি যাযাবর আর্যরা শুধুই তাচ্ছিল্যই প্রকাশ করতেন। এছাড়া, আমরা আরও কিছু বৃত্তিজীবী, কৌম সমাজভুক্ত পুজিষ্ঠ ও নিষাদ, শিপিবিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত দেবতা ত্রয়ী অর্থাৎ ভব, শর্ব ও শিপিবিষ্টের কথা উল্লেখ করতে পারি,–এদেরই সমন্বয়ে পরবর্তীকালে রুদ্র-শিব দেবতাটির জন্ম হয়েছিল। এই যুগনদ্ধ দেব-কল্পনায় ও দেবতার দেহ বর্ণনায় অনার্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আর্যদের মানসিক প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্তি। জাতিগত সংমিশ্রণ ও ধর্মীয় সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন অনার্য ভাবনা যখন কতকটা মর্যাদা অর্জন করেছিল, আর্যদের ধর্মতত্ত্বে তখনই তাদের জন্য চূড়ান্ত স্থানও নির্দিষ্ট হ'ল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের সঙ্গে যজুর্বেদও এই যুগের অন্যতম সৃষ্টি।

অনার্যদের দেবতার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনতর আর্যদেবতা রুদ্রের নিয়ত উল্লেখও দেখতে পাই ; তিনি মূলত প্রসন্ন ভাবমূর্তিরই দেবতা ছিলেন এবং যজুর্বেদের ক্ষেত্রেও তার এই প্রসন্নতা অটুট ছিল। তবে, যজুর্বেদে চিত্রিত রুদ্রদেবের ব্যক্তিত্বে হয়ত বিমূর্ত কোনো দেবতার অর্থাৎ আকস্মিক দুর্ঘটনার অধিষ্ঠাতা একটি দেবতার উপযুক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য গুণাবলী যুক্ত হয়েছিল। সৌর দেব-গোষ্ঠীর প্রসন্নতা প্রার্থনা করে যতই প্রশস্তিবচন উচ্চারিত হাোক না কেন, তৎকালীন সমাজে তা আকস্মিক দুর্ঘটনার কোনও অভাব ছিল না–গবাদি পশু হঠাৎ মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হত, মানব-শিশুর মৃত্যুর হারও অধিক ছিল, বহুবিধ অজ্ঞাত কারণে মানুষ ক্ষুধা, ব্যাধি, বিপদ ও মৃত্যুর আশঙ্কায় পীড়িত হত। বৈদিক রুদ্রদেবের নেতিমূলক এবং অশুভসূচক ব্যক্তিত্বটি এইসব ধ্বংসকারী শক্তির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল। বস্তুত, সকল দেবতাই মূলগতভাবে দ্বৈত চরিত্রযুক্ত-র্তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রার্থনাতেও তাই দ্বিবিধ তাৎপর্য-দেবতার ব্যক্তিত্বে নিহিত সমস্ত অশুভের দূরীকরণ এবং আকাঙক্ষাপূরণের জন্য আশীর্বাদলাভ। আর্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনার্যরা যেহেতু অমঙ্গলের মূর্ত রূপ বলেই গণ্য হ'ত, তাই অনার্য উৎসজাত দেবতাও ভয়ংকর ও অশুভ বলে চিত্রিত হতেন। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে যখন রুদ্রের জটিল ভাবমূর্তি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল, এই দ্বৈত বোধই হয়ে উঠল তার শক্তির উৎস। তাই, অগ্নিচয়নের মতো প্রধান ও গাম্ভীর্যপূর্ণ যাগের অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করেও রুদ্রদেবের প্রসন্নতা লাভের জন্য প্রশান্তি ও প্রার্থনা নিবেদিত হ'ল। আর্য ও অনার্য উপাদানের জাতিগত ও

সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্তরের নিদর্শন শতরুদ্রীয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। যজুর্বেদের প্রত্নকথাগুলির সৃষ্টির পশ্চাতে যে সামাজিক প্রেরণা সক্রিয় ছিল, তার চরিত্র অনুধাবন করা খুব কঠিন নয়। বিবাহসূত্রে অনার্যরা যখন আর্যদের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আর্য ধর্ম-ভাবনার মৌল প্রবণতাগুলি আত্মসাৎ করে নিচ্ছিল, তখন নতুন উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণের সমর্থনে ধীরে ধীরে তাদের যৌথ অবচেতনায়সুসঙ্গত প্রত্নপৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্টি হ'ল। তৈত্তিরীয় সংহিতার বিভিন্ন প্রত্নকথার ক্ষেত্রে এই প্রবণতাই অক্ষ-স্বরূপ।

চূড়ান্ত বিচারে একথাই বলা যায় যে, যজ্ঞের মহিমা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানের দক্ষিণার গুরুত্বও বহুগুণ বর্ধিত হ'ল। এই দক্ষিণার বর্ধিত গৌরব থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরোহিত শ্রেণীর ক্রমিক উত্থানের সঙ্গলে তারা সমাজের অগ্রগামী অংশে পরিণত হয়েছিল। ইতোমধ্যে আক্রমণকারী আর্যরা ভারতভূমিতে কৃষিজীবীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের আয়-বৃদ্ধির প্রয়োজনে গোসম্পদ উন্নয়ন, প্রাথমিক কারুশিল্প এবং কিছু কিছু বাণিজ্য জীবিকা ও বৃত্তি হিসাবে অবলম্বন করেছিল। সুনির্দিষ্ট হ'ল ; মৃগয়া ও পশুপালনের যুগে যা সম্ভব ছিল না, কৃষিব্যবস্থার যুগে বর্ষাকালেও খাদ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রেণীগত বিভাজনের ফলে কৃষিকার্যের দায়িত্ব বৈশ্য ও শূদ্রদের উপর ন্যস্ত হ'ল, যাতে উদ্বৃত্তি সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং তারই কল্যাণে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের মুষ্টিমেয় কিছু লোক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। এই পরিশ্রমভোগী শ্রেণীর লোকেরাই কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক বর্ষপঞ্জী আবিষ্কার করল এবং এরাই জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, যুক্তি, বিদ্যা ও সাধারণী করণের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত ছিল। সমাজের পক্ষ থেকে এরা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেই শুধু সাহায্য করত না, সমাজের আধ্যাত্মিক অভিভাবকের ভূমিকা অর্জন করে নিল এবং এরাই যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাও ব্যাখ্যা করেছিল। শাসন বা জাদু-পুরোহিত এবং জাদুকর সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি রূপে তাদের গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বহু প্রাচীন রীতি অর্থাৎ সম্পদের প্রতীকরূপে আদিম পশুচারী যুগের সরল পশুবলি প্রথাকে। এঁরা নূতন জটিল এক স্তরে পুনরুজ্জীবিত বা পুন:প্রচলিত করলেন এবং অগ্নির উদ্দেশে তার প্রত্যেকটি অঙ্গ অর্পণ করে জনগণের কাছে এই অনুষ্ঠানের প্রত্যাশিত ফলগুলি বিবৃত করলেন। এইভাবে কৃষিজীবী যুগে পশুবলি নুতন ভূমিকায় ও নূতন মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

এই প্রাচীন প্রথাকে সাহিত্যগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে সুসমন্বিত করার প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফসলররূপেই যজুর্বেদ জন্ম নিয়েছিল ; সুষম ও সুস্থির খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং তার ফলস্বরাপ উৎপাদনের স্তরে জনসাধারণের একটি অংশের শ্রমসাধ্য কর্ম থেকে অব্যাহতি লাভের ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নির্বিয়ে ও উৎপাদন প্রচুর পরিমাণ করে তোলার প্রয়োজনে প্রাগুক্তি সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ কল্পনা করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এই প্রত্যয়ও সুদৃঢ় হয়েছিল যে, বিধিমত যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করলে মানুষের সকল প্রচেষ্টা প্রকৃতির দাক্ষিণ্য লাভ করবে, দানব শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করবে: না এবং দেবতারা তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। এইগুলি যেহেতু মৌলিক প্রক্রিয়ারূপে গণ্য হত, পুরোহিত্য-তন্ত্র গৌরবান্বিত হ'ল, পুরোহিতের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিততর হল। যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি দীর্ঘতর, জটিলতর, ব্যাপকতর ও অগণ্য হয়ে উঠল এবং যজ্ঞের দক্ষিণা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল।

নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নূতন নূতন জীবিকার আবির্ভাবও আমরা লক্ষ্য করি। বৎসর জ্ঞাপক 'বর্ষ' শব্দের মধ্যে স্পষ্টতই বার্ষিক বৃষ্টিপাত বা বর্ষার প্রভাব রয়েছে। নক্ষত্র, রাশি ইত্যাদি সম্বন্ধে নবজাত কৌতুহল সম্ভবত নৌ-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত যেহেতু বিভিন্ন নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া তৎকালীন নাবিকদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। সরল স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্রকল্পের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে ক্রমে স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণের বিদ্যা বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ সাহিত্যে অতিপাল্লবিত যজ্ঞধর্মের যে বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই, তারই অব্যবহিত পূর্ববতী যজ্ঞপ্রিক্রিয়াগুলি যজুর্বেদে বিবৃত হয়েছে। যজুর্বেদ-সংহিতার শেষ পনেরোটি অধ্যায় (২৬-৪০) পরবর্তীকালে সংযোজিত বলেই নবগঠিত রাজ্যসমূহের প্রশাসক রাজাদের দ্বারা পালনীয় সৌত্রামণী, পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও প্রবর্গের মতো যজ্ঞ সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ছাব্বিশ অধ্যায়ের প্রথম ছয়টি মন্ত্র অর্থাৎ : 'শিবসংকল্প' সূত্রটি আপন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে উপনিষদের সঙ্গে তুলনীয় এবং এ সংহিতার শেষতম অধ্যায়টিই ঈশোপনিষদ। সুতরাং এই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে স্পষ্টত নবোদগত ক্ষত্রিয় ও রাজকীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী মন্ত্র এবং ঔপনিষদিক বিষয়বস্তু সংযুক্ত করে যজুর্বেদ সংহিতাকে সার্বভৌম রূপ দেওয়ার সচেতন চেষ্টা হয়েছিল। এভাবে যজুর্বেদের মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্রমাগত জটিলতা

অর্জনের প্রক্রিয়া এমন একটি কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃত হয়েছে। যখন উত্তরভারতে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ধর্মভাবনার নিদর্শনরূপে যজুর্বেদের বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য ; নিরন্তর বৃদ্ধি, পরিবর্তন ও উন্নতির উপযোগী গতিশীলতার সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত এর মধ্যে রয়েছে ; বিশেষত শেষের কয়েকটি অধ্যায়ের পরবর্তী বৈদিক যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই।